# বাংলা নাটক

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

শাস্ত্রে আছে, ---নিষ্ক্রিয় নিশ্চল, নিপাধি পরম পুষের মনে হঠাৎ একদিন সখ জাগল 'একোহহং বহুস্যামি'---আমি এক আ ছি বহু হব। সেই দিন থেকে তিনি হলেন স্রষ্টা কবি । উৎসবক্ষেত্রে আলোক মালার মত অনন্ত নভোমণ্ডলে ফুটে উঠল গ্রহ, তারা, উজ্জ্বল জোতিষ্কমণ্ডলী। এই সৃষ্টি- স্রষ্টার খেয়াল বহুরূপে বহুরসে, বহু ভাবের অভিব্যক্তি দিয়ে তিনি আপনাকেই পুঃনপুনঃ আস্বাদন করেন এই তাঁর লীলা। তিনি আপন আনন্দে সৃষ্টি করেন, ----আপন আনন্দে ধবংস করেন। এই যে নিজেকে বহুরূপে, বহুভাবে প্রকাশ করার ইচছা ---ইহাই নটনাথের নাট্যলীলা।

আমাদের রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয়ের মূল কথাও এই। আমি বহু হব, বহু মানবের মনোভাব আমি আমার মধ্যে অনুভব করব এবং প্রকাশ করব। নাটের এই শ্রেষ্ঠ কামনা, আমার মনে হয় নট-প্রবৃত্তি মানুষের একটি সহজাত বৃত্তি। ছোট ছেলেমেয়েরা অন্য কোন রকম খেলা শিখবার আগে খেলাঘরে যে পুতুল-খেলা করে,---কত আয়োজনে শিশু তার খেলাঘর গড়ে তে ালে, তারপর কত তুচছ কারণে তাকে ভেঙে ফেলে,-- আবার নূতন খেলা আরম্ভ হয়। ছোট ছেলেমেয়ের এই খেলা-ঘরের ভাঙা-গড়ার মধ্যে যে নাট্যলীলা বৃহৎ সংসারের খেলাঘরে (Doll's home-ও) ও তাই।

যে আশা আকাঙক্ষা নিয়ে মানুষের জাগতিক জীবন, সেই আশা - আকাঙক্ষা নিয়েই তার নাট্যলীলা। আবার দেশ ও ক াল ভেদে মানুষের জীবনের আদর্শ যেমন পরিবর্তন হয়, নাটক ও নাট্যাভিনয়ের আদর্শও ঠিক তেমনি রূপান্তর গ্রহণ করে। জাতির আত্মার সঙ্গে সেই জাতির নাটকের যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এমন আর কোন সাহিত্যের সঙ্গেই নয়। প্রতি জাতির নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ধারা সম্পূর্ণ পৃথক। তবে মানব-আত্মা যখন দেশ কালের বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে---যখন সে নীল আক াশের পাখীর মত বাধা -বন্ধ-হারা, তখনই কেবল তার জাতিভেদ থাকে না,---সর্ব দেশেরই মানুষ তখন যে ভাষায় কথা কয়, তার সুর ও ভঙ্গী সর্বত্রই এক। পৃথিবীর সর্বত্র---বোধ করি সকল জাতির ভিতরই কোন না কোন নাট্যভিনয়ের চলন আছে। আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেই নাট্যভিনয় চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। তার প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নাটকাবলী। নাটকগুলি মনোযোগের সঙ্গে পড়লেই বোঝা যায় এগুলি শুধু পাঠ্য - পুস্তক নয়, বিশেষ করে মহ াকবি ভাসের নাটক। তাছাড়া সেকালের অনেক আখ্যায়িকায় অতি স্পষ্টভাবে নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ আছে। আমাদের ব াংলাদেশের নাটক ও নাট্যাভিনয় কিন্তু সেই প্রাচীনকালের নাট্যাভিনয়ের পরিণতি নয়। বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে সে পরিমাণে পৃথক। বাংলা নাট্যাভিনয়ও ঠিক সে পরিমাণেই অন্য রকম। প্রাচীন মগধে (পাট লীপুত্র, কুসুমপুর প্রভৃতি রাজধাণীতে) সংস্কৃত আদর্শের নাট্যাভিনয় সেকালে অনুষ্ঠিত হত সন্দেহ নাই, ---কিন্তু খাঁটী বাংলা ভাষ ায় বাঙালী জনসাধারণের যে নাট্যাভিনয় হল তার রূপ পৃথক। প্রকৃত সংস্কৃত নাটক হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই নাট্যাভিনয়ের অনুষ্ঠাতা ও আচার্য স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ দেব। পৃথিবীর মানুষের সুখ - দুঃখ, প্রেমের কাহিনী সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের বিষয়বস্তু। কিন্তু গৌরাঙ্গদেবের যাত্রার বিষয়বস্তু ----শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত। এবং আজ পর্যন্ত কৃষ্ণলীলাই বাঙালী জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ন াট্যবস্তু। ইহার অফুরন্ত রসধারা বাঙালী দর্শককে চিরদিন উন্মত্ত করে । কৃষ্ণ যাত্রার গানে বাঙালী এমন পাগল যে অন্য গ ানকে তাঁরা মানতেই চায় না। বলে--'কানুবৈ আর গীত নাই'। কানুর গান তার কাছে পুরনো হ'ল না। শ্রেষ্ঠ মহাজন বৈষ্ণব কবি থেকে আরম্ভ ক'রে, বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী নীলকণ্ঠ, কৃষ্ণকমল, দাশরথি, রসিক চক্রবর্ত্তী সকলের গান সে শুনেছে, এখনও শুনতে চায়। কৃষ্ণযাত্রাই আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় নাট্যাভিনয়। তারপর এল ইংরাজী শিক্ষার যুগ। কয়েক বছরের ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙলায় সাহিত্য ও চিন্তাধারায় যে রূপান্তর ঘটল, তা ইতিপূর্বে আর কোন দেশে

ঘটেছে কিনা জানি না। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে জনৈক খ্যাতনামা লেখক (বোধ করি স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু) বলেছেন---- 'We cannot describe the great change better than by stating that English conquest and English education may be supposed to have removed Bengal from the moral atmosphere of Asia to that of Europe. All the great events which influenced European thought within the last hundred years have also told, however feeble then effect may be on the formation of the intellect of modern Bengal'

বাঙালীর জাতীয় জীবনের ভাবের ধারায় উচছল বান ডাকল। তখন থেকেই বাঙালীর ভিতর একটি বৃহত্তর জাতিভেদ দেখা দিল। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী আর শুধু বাঙালী । এই দুই সম্প্রদায় যেন দুটি পৃথক জাতি। তখনকার দিনের সাহেবদের কাছে তথাকথিত ইংরাজী শিক্ষিতের জন্যই রঙ্গমঞ্চ গড়া হয়েছিল। সবারই মনে হ'ল ওই রকম সাজ-পোষাক পরে, আলো জ্বালিয়ে, তলোয়ার নিয়ে যদি অভিনয় না হ'ল তো কিসের অভিনয় ! রাধাকৃষ্ণের প্যান্‌প্যানানি, শুক - সারীর কলহ ---ওতে ইতর সাধাণের রসের পিপাসা হয়তো মিটতে পারে --- কিন্তু যেহেতু আমরা সেক্সপীয়র পড়েছি, মিল্‌টন পড়েছি----ও সব আমাদের ভাল লাগবে না।

তারপর রঙ্গালয় গড়া হল। পাশ্চাত্যের অনুকরণে কত ভাঙাগড়া---কত রকমের অভিনয় ভঙ্গিমা, গ্যারিক, অ ারভিং,বীরমোট্টী কত নাম, কত তর্ক, কত আলো, কত তলোয়ার, কত প্যাঁচ, ষ্টেজের উপর অট্টালিকা, গাড়ী,ঘোড়া, নদী, পাহাড় কত কাণ্ড হল---কিন্তু সেই যে মথুরার রাজবেশী কৃষ্ণকে যে গান গেয়ে বৃন্দা তিরস্কার করেছিলেন---(সে আসরে বৃন্দার কণ্ঠের সুর ছাড়া আর কিছু ছিল না) সে রকম মর্মস্পর্শী গান আর কেউ গাইল না। কথাটা বুঝেছিলেন গিরিশচন্দ্র । তাই সেই প্রথম পাশ্চাত্য অনুকরণের যুগেও তিনি পৌরাণিক নাটক লিখবার এবং পৌরণিক নাটক অভিনয় করবার যে রীতি প্রবর্তন করেছিলেন---সেই রীতিই আজ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আজকের দিনে আমাদের সমস্যা ---কি করে বাঙালীর নাট্যমন্দিরকে বাঙালীর বিশিষ্ট রূপটি দেওয়া যাবে। বাংলা থিয়েটার চলছে না---সবারই এই অভিযোগ। আমরা পুরাপুরি ইংরাজী অনুকরণ করতে পারিনি, international হব কিনা বুঝতে পারছি না---কি উপায়ে ওটা হওয়া যায়, তাও জানা নাই। আমাদের দর্শক মুষ্টিমেয় অর্ধশিক্ষিত বাঙালী । বৃহৎ বাঙালী জাতি আমাদের রঙ্গালয়ের দ্বার দিয়ে যাতায়াত করে---ভিতরে প্রবেশ করে না। তাদের মত করে যদি কেউ রঙ্গালয় গড়তে পারেন, নাটক লিখতে পারেন---বাঙলার রঙ্গালয় আবার বাঁচবে।

অভিনয়

সত্যকারের অভিনয় যে শিক্ষা দেবার বস্তু নয় সে কথা বোধহয় আমার সঙ্গে অনেকেই স্বীকার করবেন। ক্লাসের যে কোন একটি ভাল ছেলেকে তালিম দিয়ে যেমন কবি সৃষ্টি করা যায় না ----তেমনি যে-কোন সুন্দর চেহারার যুবককে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বড় একটি ভূমিকা (--প্রবীর বা অর্জুন) মুখস্ত করালেই তাকে অভিনেতা তৈরী করা যায় না। কবির মত অভিনেতাও জন্মায়। অভিনয় যেটুকু শিক্ষক শেখাতে পারেন বা ছাত্র গ্রহণ করতে পারে---সে অংশ অতি সামান্য। একটি ভূমিকার কথার অংশ কেমন করে আবৃত্তি করতে হবে--- কিম্বা অভিনেতা কেমনভাবে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবেন, চলবেন বা প্রস্থান করবেন---শিক্ষক এইটুকুই শেখাতে পারেন। সংসারে পরকে আপন করা কাজটা নেহাৎ সহজ কাজ নয়---সকলে পারে না---অভিনেতার কাজ শুধু পরকে আপন করা নয়---আপনি পর হয়ে যাওয়া । বোধহয় এর চেয়ে বড় সাধনা আর নেই। আমার নিজের অস্তিত্বকে ডুবিয়ে দিয়ে আমি যে ভূমিকা অভিনয় করবো তারই প্রাণ নিয়ে আমাকে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াতে হবে। এর জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক হয় সেই ভূমিকার কল্পিত মানুষটিকে ভালবাসা---তার প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভুতি---তার ছোটখাট ভুল - চুক, দোষ ত্রুটি ---তার ভাষায় কথা কওয়া, তার মত করে হাঁটা, যে কাপড় পরলে তাকে ভাল দেখায় সেই কাপড় পরা। তার গায়ের রং বয়স চুল-দাড়ি পর্যন্ত সমস্তটা কল্পনা করে নিতে হয়। এত করেও হয়তো প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাও হ'তে পারে। কেননা প্রাণ প্রতিষ্ঠার কোন নিয়ম নেই, কোন অভিনেতা অন্য কোন অভিনেতাকে শেখাতে পারে না।--- কেমন

করে ভূমিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তবে প্রাণের আবির্ভাব যখন হয় তখন আর বুঝতে কারো বাকি থাকে না।

শ্রী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্বের ইতিহাস---একটি চমৎকার কাহিনী আছে। যেটির দ্বারা নাট্যাভিনয়ের মর্মকথা একটু বোঝা যায়। কথাটি এই শ্রীমতী রাধা, শ্রীকৃষ্ণগত প্রাণা কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণ আরাধনা সম্বন্ধে শ্রীমতী রাধাই শেষ কথা। এ হেন শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রীতি কেমন, তার প্রকৃতি কি রকম---তার স্বরূপ কি ---জানবার ইচ্ছা হ'ল শ্রীকৃষ্ণের---এবং কৃষ্ণ প্রীতিই বা কিরূপ তাও জানতে তাঁর সাধ হ'ল যথা-----

'দর্শনাস্যে হেরি প্রিয়ে আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে সাধ করি আস্বাদিতে নারি।।
তোমার স্বরূপ বিনা নহে আস্বাদন।
সেই হেতু হ'তে হবে গৌরবরণ।।'

শ্রীকৃষ্ণকেও শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি অনুভব করবার জন্য শ্রীমতীর মত গৌরবর্ণ হ'তে হয়েছিল---তবে তিনি কৃষ্ণভক্তি রস আস্বাদ করতে পেরেছিলেন। অভিনেতার পক্ষেও সবচেয়ে বড়কথা----

'তোমার স্বরূপ বিনা নহে আস্বাদন।'---
যে ভূমিকাটির অভিনয় তার স্বরূপ কি,
ধ্যানমন্ত্রে আগে তাই জানতে হবে।